IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

মরমিয়া কাব্যভাবনার আলোকে দেওয়ান হাসন রাজা চৌধুরী

মহুয়া মারিক (Research scholar, Seacom Skills University)

Key words:- মরমিয়া চেতনা, অতীন্দ্রিয়ানুভূতি, অসাম্প্রদায়িকতা, দার্শনিকতা, আধ্যাত্মিকতা, বৈরাগ্য, জীবনদর্শন, মননলব্ধ উপলব্ধি।

Abstract: -বাংলাদেশের মর্মের কবি, মরমি কবি দেওয়ান হাসন রাজা চৌধুরী। যাঁর সৃষ্টি, সাধনা ও জীবন দর্শনে বাংলা গানের সমৃদ্ধি। তাঁর আত্মজীবন দর্শনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে সমগ্র মানব জীবন দর্শন।গানের ছত্রে ছত্রে তিনি নিজের হৃদয় দিয়ে সাধারণ মানুষের মনের কথাকে খুঁজেছেন।তাঁর মগ্নচৈতন্যে যেমন ক্রিয়াশীল ছিল মুসলিম পূর্বপুরুষদের ধারণা তেমনি তার সাথে এদেশীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের ধারণাও এসে যুক্ত হয়েছিল। তাই তাঁর সৃষ্টির সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয় এই বহুত্ববাদী সমাজ সংস্কৃতির বলিষ্ঠ রূপ।শাস্ত্রীয় ধর্মনিরপেক্ষ জীবনাচরণের এই গূঢ় ধারাই মরমিয়াবাদরূপে চিহ্নিত। তিনি ছিলেন উদার অসাম্প্রদায়িক কবি। হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ ভুলে তিনি মানবতাকেই সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। আমিত্ব নাশ করে বৈরাগ্যের চরম স্তরে প্রেমিক হাসন রাজা পরিণত হয়েছেন দার্শনিক হাসন রাজাতে। তাঁর গানে প্রতিফলিত হয়েছে নশ্বর পার্থিব জীবনের সারমর্ম।মরমি কবি, হাসন রাজার ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য কারণ তাঁর সৃষ্টিরাজিতেও আমরা দেখি পরমেশ্বরের জন্য বিরহবোধ, সাধকের অনুতপ্ত হৃদয়ের ব্যাকুলতা এবং এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সাথে গভীর একাত্মতার উপলব্ধি।

মূল প্রবন্ধ

“ছাড়িলাম হাছনের নাওরে
হাছন রাজার নাওরে
ঢল ঢল ঘোরা
ওরে বৈঠা না ফালাইতে নাওয়ে
শূন্যে করে উড়া রে…”

(হাসন বাহার / প্রথম পর্ব / ৭৬ সংখ্যক গান)

নদীর স্রোতধারা তাঁর গীতিমূর্ছনায় গতি পেত, মনের চলাচলের সাথে পাল্লা দিত সুরমা নদীর পানসি, স্বভাবজাত শৈল্পিক দক্ষতায় কথা, সুর, তাল, লয়ের সাথে একাকার হয়ে যেত অকৃত্রিম প্রকৃতি তথা মানব প্রকৃতি - প্রাণে প্রাণে, গানে গানে তাঁর সেই অনুভব বিধৃত হত বিস্তৃত হত হৃদয় থেকে হৃদয়ান্তরে। তিনি বাংলাদেশের মর্মের কবি, মরমি কবি দেওয়ান হাসন রাজা চৌধুরী। যাঁর সৃষ্টি, সাধনা ও জীবন দর্শনে বাংলা গানের সমৃদ্ধি। প্রাচ্য মরমি চিন্তায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে তাঁর এই মর্মস্পর্শী সঙ্গীতসম্ভার। উদার মানবতাবাদী দার্শনিক কবি হাসন রাজার গানের বিষয় বৈশিষ্ট্য, আঙ্গিক বৈচিত্র্য ও গভীর মরমি চিন্তা গানগুলিকে চিরকালীন সম্পদে পরিণত করেছে।

আবহমান কালের বিষয় বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ তাঁর সৃষ্টিসম্ভার। বাংলার লোকায়ত জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গী জড়িত যার মূল সুর। এক লৌকিক সহজিয়া দর্শনতত্ত্বের আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এর অঙ্গসৌষ্ঠব। আর তাঁর আত্মজীবন দর্শনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে সমগ্র মানব জীবন দর্শন। রূপসাগরে ডুব দিয়েছেন তিনি অরূপ রতন কামনা করে - এই কামনা তথা সাধনার মাধ্যম হয়ে উঠেছে তাঁর গান। যে গানের জন্ম মানবপ্রেম আর ভগবৎ প্রেম উপলব্ধির বাসনা থেকে পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার মিলনের তীব্র আকাঙ্খা থেকে। অন্তরের অন্তঃস্থলে যে নিখাদ প্রেম, সেই প্রেমকে সম্বল করে হাসন রাজা অধরাকে ধরতে চেয়েছেন - এখানেই তাঁর অসামান্যতা।

বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট বিভাগের অধীন সুনামগঞ্জ জেলার সুনামগঞ্জ শহরের উপকন্ঠে লক্ষণশ্রী গ্রামেই ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারি, জন্মগ্রহণ করেন এই মরমিয়া কবি দেওয়ান হাসন রাজা চৌধুরী। পিতা দেওয়া আলী রাজা চৌধুরী, মা হুরমত জাহান বিবি। সুরমা নদীর তীরবর্তী এই লক্ষণশ্রী গ্রামের মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশেই হাসন রাজার বেড়ে ওঠা। একদিকে প্রাণবন্ত সুরমা নদী আর অন্যদিকে সেই জলরাশি স্পর্শ করে, উত্তর পশ্চিম দিগন্ত বরাবর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে খাসিয়া পাহাড়, প্রকৃতির এই অপরূপ মেলবন্ধন, তার অপার সৌন্দর্য হাসন রাজার মনোভূমিতে কবিত্বের বীজ বপনে সহায়ক হয়েছিল।

পিতা দেওয়ান আলী রাজা চৌধুরী পুত্রের নামকরণ করেন বৈমাত্রেয় বড় ভাই উবায়দুর রাজার নামের সাথে মিল রেখে - আহিদুর রাজা। কিন্তু মা হুরমত জাহান বিবির ছেলের নাম পছন্দ না হওয়ায় তা পরিবর্তন করে ঠিক হয় হাসন রাজা। বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের মন্তব্যটি এখানে প্রাসঙ্গিক – “সিলেটের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ফার্সী ভাষাবিজ্ঞ নাজির আবদুল্লা বলে আলী রাজা সাহেবের এক বন্ধু তার নামকরণ করেন হাসন রাজা। তদব্‌ধি তিনি আহিদুর রাজা ও হাসন রাজা এই উভয় নামেই আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব মহলে পরিচিত ছিলেন। কৈশোর পর্যন্ত নানাবিধ দলিল দস্তাবেজে তাঁকে অহিদুর রাজা বলে উল্লেখ

করা হয়েছে। তবে পরিণত বয়সে তিনি হাসন রাজা নামে পরিচিত হতেই পছন্দ করতেন বলে এ নামেই তিনি সর্বসাধারণের কাছে খ্যাতি লাভ করেন।" [1]

তাঁর সম্পূর্ণ নাম, দেওয়ান হাসন রাজা চৌধুরী, 'রাজা' তাঁদের বংশজাত উপাধি। নবাবি আমলে হাসন রাজার পিতামহ আনোয়ার খাঁ কৌড়িয়া পরগনার রাজস্ব আদায়কারী বা চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হন। পরবর্তী সময় ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে হাসন রাজার পিতা আলী রাজা চৌধুরীকে সিলেটের তৎকালীন কালেক্টর 'দেওয়ান' এই উপাধি ব্যবহারের জন্য লিখিত অনুরোধ করা হয়। এই কারণেই বংশপরম্পরায় তারা 'দেওয়ান' পদবী ব্যবহার করে আসছেন।

উত্তরাধিকারসূত্রে হাসন রাজা বিশাল জমিদারির অধীশ্বর ছিলেন। পিতৃ ও মাতৃসূত্রে দুই জায়গায় জমিদারি ছিল তাঁর। পিতৃসূত্রে বর্তমান সিলেট বিভাগের বিশ্বনাথ উপজেলার রামপাশাতে ছিল তাঁর বিশাল জমিদারি আর মাতৃসূত্রে সুনামগঞ্জের জমিদার ছিলেন তিনি। প্রথম যৌবনে হাসন রাজা ছিলেন ভোগবিলাসী এবং সৌখিন এক মানুষ। জমিদার হিসাবে কখনো কঠোর, কখনো নির্মম হলেও মনে প্রাণে এক উদার মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর সম্পর্কে গবেষক ডঃ আবদুল ওয়াহাবের মন্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক - "হাসন রাজা ছিলেন একজন জমিদার, কিন্তু জমিদারের বাহাদুরি, আহামরি ভাব তা তাঁর মোটেই ছিল না। তাঁর জীবনের আদর্শ ছিল গ্রামবাসীর সঙ্গে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেলামেশা। তাঁর মনের মধ্যে অহমিকাভাব কখনো প্রশ্রয় পায়নি।" [2]

কোনো প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ করেননি তিনি কিন্তু বনের ফুল যেমন মালির হাতের যত্নের অপেক্ষা না করেই নিজের রূপ-বর্ণ-গন্ধ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে তেমনি এই মরমিয়া কবি আপন বৈচিত্র্যময় জীবন নিয়ে বাংলাদেশের পল্লীবাসীর হৃদয় আকর্ষণ করেছিলেন। হাসন রাজার জীবন-তথ্যের আদি গবেষক তথা লেখক প্রভাত কুমার শর্মার কথায় - "বাঙলার সেই মধ্যযুগে এদেশে শিক্ষার বহুল প্রচার না হওয়ায় তাঁহার শিক্ষার প্রতি তখন কোনো মনোযোগই দেওয়া হয় নাই। কিন্তু বনের ফুল যেমন মালীর হাতের সেবার অপেক্ষা না রাখিয়াই আপনার মত বর্ণে গন্ধে ভরিয়া ওঠে, শিক্ষার অভাবের মধ্যেও তেমনি এই বাউল কবির চিত্ত বৈরাগ্যও প্রেমের আলোকে এক রমনীয় বন্য সৌন্দর্যে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল।" [3] বাংলাদেশের ঊনিশ শতকের শেষ ভাগের আর একজন স্বনামধন্য লেখক তথা ঐতিহাসিক সৈয়দ মুর্তজা আলীর মন্তব্যটিও এখানে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য - "হাসন রাজা ছিলেন স্বভাব কবি। নশ্বর জগতের ভোগবিলাসের ঊর্ধ্বে ছিল তাঁর দৃষ্টি। বিষয় বৈভবের মধ্যে থেকেও তিনি অনেকটা নির্লিপ্ত জীবন যাপন করে গেছেন। আল্লাহর প্রেমের বসন্ত

[১] চক্রবর্তী ৬, মৃদুলকান্তি, হাসন রাজা, তাঁর গানের তরী, পৃষ্ঠা-২৭।

[২] আবদুল ওয়াহাব, লালন-হাসন জীবন-কর্ম-সমাজ, বাংলা একাডেমি, জুন ২০০৯, ঢাকা, পৃ: ২৮৮।

[৩] দেওয়ান মোহাম্মদ তাছাওয়ার রাজা সম্পাদিত, উদ্ধৃতি, হাসন রাজা সমগ্র, পাঠক সমাবেশ, জানুয়ারি, ২০০৯, ঢাকা, পৃ: ১৫

হিল্লোলে তাঁর হৃদয়মুকুল বিকশিত হয়েছিল। ভাবে আবেগে সহজ সরল ভাষায় রচিত তাঁর গান বাংলাদেশের পল্লীবাসীর হৃদয় আকর্ষণ করে।" [৪]

অসংখ্য গানের স্রষ্টা তিনি। যার কথা সুর, ছন্দ আজও ভেসে বেড়ায় সিলেট ও সুনামগঞ্জের আকাশে বাতাসে। প্রতিনিয়ত বহমান মানব জীবনে তিনি তাঁর গানের আটপৌরে ভাষাকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেই কারণে অত্যন্ত সহজেই তাঁর গান মানব হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল। তাঁর গানের সঙ্গে বাংলার লোকায়ত জীবনের এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বর্তমান। গানের ছত্রে ছত্রে তিনি নিজের হৃদয় দিয়ে সাধারণ মানুষের মনের কথাকে খুঁজেছেন। আবহমান কালের বিষয় তাঁর গানের উপজীব্য যা সকল মানুষের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। কৈশোর থেকেই তাঁর গান রচনার সূত্রপাত। একদিকে সুনামগঞ্জের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আর একদিকে সুরমা নদীর অসামান্য রূপবৈচিত্র্য হাসন রাজার মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর এই উপলব্ধি ধরা আছে গানের ছত্রে ছত্রে -

"অচিনপুরের অচিন মানুষ তোমারে না আমি চিনি
ভবেতে আসিয়া তুমি খেলছ কেন ছিনিমিনি।
সুরমা নদীর স্রোতে ভাইস্যা অচিনপুরের বাঁকে ...
হাসন রাজা বেবুঝ হইয়া তোমায় কেবল ডাকে"

(হাসন বাহার /দ্বিতীয় পর্ব /১ সংখ্যক গান)

কিংবা

"কিবা ক্ষণে দেখিয়া তোমায় হাসন রাজার আঁখি
সুরমা নদীর ঢল নামিছে তার নাই আর বাকি" ।

(হাসন বাহার / দ্বিতীয় পর্ব / ২৯ সংখ্যক গান)

সুনামগঞ্জের এই সুরমা নদী ও রামপাশার কাপনা নদীতে নৌকা বাইচ দেখে হাসন রাজার মনে ছন্দ জাগত আর নৌকার গতির তালে তালে আন্দোলিত সেই কবিহৃদয় থেকে উৎসারিত হত সারিগান। কখনো নিজ কণ্ঠে, কখনো বা গায়েনদের কণ্ঠে মাদকতা সৃষ্টি করত তাঁর গান -

"ওরে আমার পাগলা মাঝি
পাগলা নে তোর বৈঠা নে।
ঈশান কোনে সাজ কইরাছে
মেঘ ডাইকাছে বায়ু কোণে রে
আমি ঠেকলাম পাগলা মাঝি লইয়া
নাও ভিড়াইতে উল্টা টানে।
হাছন রাজার ভাঙ্গা তরী
নাই যে কড়ি নাই কান্ডারী
আমি মধ্যিখানে ডুইবা রইলাম
কার কাছে কই কেবা শুনে।"

(হাসন বাহার / প্রথম পর্ব / ৫৩ সংখ্যক গান)

[৪] সৈয়দ মুর্তজা আলি, প্রসঙ্গ হাসন রাজা (আবুল আরসান চৌধুরী সম্পাদিত) ১৯৯৮, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ: ৪৮

নদীর সাথে যেমন তেমন ভাবেই হাসন রাজার সাথে পরিচয় ঘটে সুনামগঞ্জের অনাবিল প্রকৃতির। উন্মুক্ত আকাশের নীচে গ্রাম্য খেলার সাথীদের সাথে খেলা, নদীর বুকে সাঁতার কাটা, ঘুড়ি ওড়ানো, মাছধরা, দোয়েল-ময়না-সারস-মুনিয়া-কুড়া সহ অসংখ্য নাম জানা ও নাম না জানা পাখি পর্যবেক্ষণ - ইত্যাদির মধ্য দিয়েই তাঁর সহজ জীবনের সূত্রপাত। কৈশোরেই তিনি পশু, পাখি যেমন হাতি, ঘোড়া, কুড়া, দোয়েল, ময়না ইত্যাদি নিয়ে গান রচনা করেছিলেন, যেখানে নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ অনুভূতিই প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল -

"ধলা হাতি, লাল হাতি, সকল হইতে আলা
ছিয়া হাতির মধ্যে যেটা, হয় অধিক কালা
এই হাতি খুব ভালো, জানিবা নিশ্চয়।
অল্প কালা রঙ্গের হাতি খুব মজবুদ নাহি হয়।"

(সৌখিন বাহার / ১০ সংখ্যক গান)

অথবা

"বড় ডাকের কোড়া ভাল, হয় নেকবক্ত
লড়াই করিতে সেই, হয় বড় শক্ত।
দলানী ডাকের কোড়া, অতি উত্তম হয়
লড়াইতে গেলে সে, করে দিগ্বিজয়।"

(সৌখিন বাহার / ৪ সংখ্যক গান)

কিংবা

"বড় দইয়াল হইতে, মধ্যম দইয়াল ভালা।
ছোট দইয়াল পালিলে, হইবেক জ্বালা॥
বড় দইয়াল বদমেজাজ, জানিবায় ভাই।
কাল পাইয়া পাখির মত, পাজি দইয়াল নাই।।"

(সৌখিন বাহার / ৯ সংখ্যক গান)

গানের প্রতিটি ছত্রই বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত।

বাল্যকাল থেকেই পর্যটনের প্রতি ছিল হাসন রাজার প্রবল আগ্রহ। পরবর্তী সময় খরছার হাওর, টাঙ্গুয়ার হাওর, কাঙলার হাওর, দেখার হাওর, গুজারিয়া বিল, ক্ষিরা বিল, চন্দার বিল, রক্তি নদী সর্বত্রই তিনি ভেসে বেড়িয়েছেন। এমন কী সুরমা কুশিয়ারা বিভক্তিতে করীমগঞ্জ এলাকার আজমিরিগঞ্জ পার হয়ে মেঘনার উপত্যকায় কিংবা গোয়ালন্দ পর্যন্তও নৌপথে তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত প্রভাতচন্দ্র গুপ্তের মন্তব্য উদ্‌ধৃত করা যায় - "যে সমাজে যে পরিবেশে ও যে নৈসর্গিক ভূখন্ডের বৈচিত্রলীলার রাজ্যে তিনি জন্মেছিলেন, তাদের প্রতি তাঁর নাড়ির টান ছিল। সিলেটের নদী নালায়, খাল বিলে, হাওরে, পাহাড়ে, গ্রামাঞ্চলে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়িয়ে মন প্রাণকে যেন সজীব সতেজ করে আনার জন্য তিনি নিয়মিত পর্যটনে বেরুতেন।" [5] তাঁর জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল সুরমানদী। সৈয়দ মুজতবা আলীর কথায় - "আসলে হাসন রাজা ডাঙ্গায় বড় একটা থাকতেন না। তিনি বাস করতেন তাঁর বিরাট ভাওয়ালি নৌকায়। আমার বাসার সামনে দিয়ে সে

[5] প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, গানের রাজা হাসন রাজা, মুক্তধারা, ১৯৮৫, ঢাকা, পৃ: ৩৭

নৌকা উজান ভাটি করত। সে নৌকো আলোকোজ্জ্বল এবং তার পাড় পর্যন্ত ভেসে আসত সুমধুর সংগীত।" [6]

পর্যটনের নেশায় যেমন হাসন রাজা ঘুরে বেড়িয়েছেন এক নদী থেকে অন্য নদী পথে তেমনি প্রিয়সঙ্গ কামনা করেও তিনি ছুটে চলেছেন জীবনভর। কাঙ্খিত প্রাণের দেখা পাওয়ার আশায় তাঁর সেই পর্যটন ছিল অন্তহীন। কখনো বিশ্বের সৌন্দর্যরাজির মধ্যে, কখনো বা আপন অন্তরের মাঝে, আবার কখনো বা মানুষের মাঝে তিনি সন্ধান করে ফিরেছেন পরমসত্তাকে। তাঁর চরিত্রে ছিল মধ্যযুগীয় ভাবধারার ছাপ। তিনি ছিলেন সত্যের অন্বেষণে নিবেদিত প্রাণ। এক অসাধারণ মানুষ। তাঁর মগ্নচৈতন্যে যেমন ক্রিয়াশীল ছিল মুসলিম পূর্বপুরুষদের ধারণা তেমনি তার সাথে এদেশীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের ধারণাও এসে যুক্ত হয়েছিল। তাই তাঁর সৃষ্টির সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয় এই বহুত্ববাদী সমাজ সংস্কৃতির বলিষ্ঠ রূপ। খ্রিষ্টীয় অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ, চর্তুদশ শতকের মধ্যে বাংলার সংস্কৃতি বৌদ্ধ-হিন্দু-মুসলিম রাজশক্তি, ক্ষাত্রশক্তির যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজ্যজয় ও বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবার ফলে বিভিন্ন পরোক্ষ পথ অনুসরণ করে গড়ে উঠতে থাকে। শাস্ত্রীয় ধর্মনিরপেক্ষ জীবনাচরণের এই গূঢ় ধারাই মরমিয়াবাদরূপে চিহ্নিত।

বাংলা সাহিত্য তথা বাংলা মরমি গানের ইতিহাসে হাসন রাজার সৃষ্টি চিরদিনের সম্পদ। বিশ্বকবি তাঁকে বলেছেন 'গ্রাম্যকবি' ও 'সাধক কবি' , অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন আখ্যা দিয়েছেন 'লোক কবি' , প্রভাত কুমার শর্মা ও দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁকে 'মরমি কবি' রূপে চিহ্নিত করেছেন। প্রকৃত অর্থেই তিনি মরমি কবি। তাঁর সৃষ্ট সুর, ছন্দ, ভাষা, ভাব মরমি সংগীতের একটি স্বতন্ত্র আবেদন সৃষ্টিতে সফল হয়েছে। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে মিলিত হয়ে সহজ সাবলীল ভাষায় মাটির সুরে অনুরনন তোলে হৃদয়তন্ত্রীতে। গবেষক আব্দুল হাইয়ের ভাষায় - "হাসন রাজার গানের শিল্পরূপ, বিশুদ্ধ ভাবাবেগ এক অকৃত্রিম আত্মপ্রত্যয়জাত।" [7] তাঁর এই স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির ত্রিবিধ প্রকাশ। তাঁর রচিত তিনটি গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়। জীবনের প্রথম অনুভূতির অকৃত্রিম প্রমাণ লক্ষ্য করা যায় 'সৌখিন বাহার' গ্রন্থে, মধ্যবর্তী পর্যায়ের অনুভব বিধৃত হয়েছে 'হাসন বাহারে' এবং অন্তিম পর্যায়ের হৃদয়ানুভূতির স্বাক্ষর রয়ে গেছে 'হাসন উদাস' গ্রন্থটিতে। এই গ্রন্থটি মরমিয়া ভাবুক পাঠকের পরম সম্পদ। হাসন রাজার জীবদ্দশায় গ্রন্থটি প্রকাশ পায়।

হাসন রাজা ছিলেন নিখাদ ঈশ্বরপ্রেমিক। জীবন রসকে আকন্ঠ পান করে তিনি হয়েছিলেন কীতকাম। সংসারের ভোগবিলাসের মধ্যে থেকেও জীবনের কামনা বাসনা থেকে আপনাকে মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। যদিও সে সাধনা ছিল কঠিন

[6] সৈয়দ মুজতবা আলী, রসিক হাসন রাজা, হাসন রাজা, মরমি মৃত্তিকার ফসল (ড· আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত) ২০০৯, উৎস প্রকাশন, ঢাকা, পৃ: ৫১

[7] হাছন পছন্দ, হাসন রাজার গান : শুদ্ধাশুদ্ধি প্রসঙ্গে: ড· আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত, প্রসঙ্গ হাসন রাজা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জানুয়ারি, ১৯৯৮, পৃ: ১১১।

নিরাসক্তির। এই সাধনাকে তিনি অন্তরের মাঝে সদাজাগ্রত রেখেছিলেন। প্রথম জীবনে স্থূল প্রেমকেই জীবনের সারাৎসার মনে করে প্রেমের সুরমা গাঙ্গে ডুব দিতে চেয়েছিলেন -

"কিবা ক্ষণে গিয়েছিলাম সুরমা নদীর গাঙ্গে
বন্ধে মোরে ভুলাইল রঙ্গে আর ঢঙ্গেরে।
হাসন রাজা নাচন করে প্রেমেরি তরঙ্গে রে
পাইলে কখন ছাড়িবে না, এই মনে পাঙ্গে রে।"

(হাসন উদাস / ১৬০ সংখ্যক গান)

কিন্তু এই প্রেম যে হৃদয়ে চিরস্থায়ী প্রশান্তি এনে দিতে পারে না তা উপলব্ধি করে তিনি একান্ত মনে পরম স্রষ্টাকে আশ্রয় করতে চান। তাঁর সাক্ষাৎলাভই তখন হাসন রাজার একমাত্র আকাঙ্খা হয়ে দেখা দেয় -

"হাসন রাজার এ বাসনা পূর্ণ কর আসি
তুমি বিনে অন্য কাউরে ভালো নাহি বাসি।
কাকুতি মিনতি করি ডাকিরে তোমায়
না আসিলে মরব হাসন তোমারও ব্যথায়।"

(হাসন বাহার / দ্বিতীয় পর্ব / ২১ সংখ্যক গান)

সুফি মতবাদের মূল কথা ঈশ্বরের সাথে পরিপূর্ণ মিলন। মানব ও ঈশ্বরের এই অবাধ মিলনের সেতু হল প্রেম। এই অর্থে হাসন রাজা প্রকৃত প্রেমিক। তাই তো তিনি নিজের 'সম্পর্কে' বলেন -

"আমি তো পিরীতের মানুষ, প্রেম বিনে তো জানিনা।"

(হাসন বাহার / প্রথম পর্ব / ২৭ সংখ্যক গান)

ঈশ্বরকে পেতে গেলে প্রেমিক হতে হয়। প্রেমহীন বাহ্যিক আড়ম্বরের দ্বারা তাঁকে লাভ করা অসম্ভব। নিম্নোক্ত গানটিতে হাসন-রাজার এই ভাবনাই প্রতিফলিত -

"খোদা মিলে প্রেমিক হইলে
পাবে না, পাবে না খোদা নামাজ রোজা কইলে।"

(হাসন উদাস / ৭১০ সংখ্যক গান)

প্রেমিক হলে তবেই তাঁকে পাওয়া যায়। প্রকৃত অর্থে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই -

"নাই আমার ঘরবাড়ি, নাইরে আমার ঠাঁই
যেখানে প্রেমিক থাকে, তার কাছে দাঁড়াই রে॥
যেখানেতে প্রেমিকরা প্রেমের আলাপ করে
আমি যে বসতি করি তাদের অন্তরে॥"

(হাসন উদাস / ১৯৮ সংখ্যক গান)

সত্য লাভের একমাত্র মাধ্যম হল প্রেম। এই প্রেমই দুর্নিবার আকর্ষণে আকর্ষিত করে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদকে-বুদ্ধির নিরীখে তার হিসাব মেলে না -

"পিরীতের মানুষ যারা, আউলা বাউলা হয় যে তারা
হাসন রাজা পিরীতি করিয়া, হইয়াছে, বুদ্ধিহারা।"

(হাসন উদাস / ১১৮ সংখ্যক গান)

হাসন রাজা তাঁর মনের মানুষকে 'অন্তরিয়া' নামে ডেকেছেন। অন্তরে যার অধিষ্ঠান-

"ও বন্ধু অন্তরিয়া রে, আমি তোরে ডাকিরে
দেখা দিয়া প্রাণ বাঁচাও রে।"

(হাসন উদাস / ৪৭ সংখ্যক গান)

নানা নামে তাঁর উপস্থিতি - কখনো আল্লাহ, মৌলা, খোদা আবার কখনো বা হরি, শ্যাম, গৌরহরি, ঠাকুর কিংবা প্রাণবন্ধু।

সকল সম্প্রদায়ের জন্য অর্জিত অতীন্দ্রিয়ানুভূতি মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর সংগীত মূর্ছনায়। মানবদেহ নশ্বর। ক্ষণস্থায়ী এই দেহ পিঞ্জরের ভিতর প্রাণটি চিরসজীব হয়ে থাকার জন্য সজীব অপর এক হৃদয়ের প্রয়োজন। যা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এক। হাসন রাজার গানের বৈশিষ্ট্য এই যে, তা মরমি মিলন মন্ত্র হয়ে অভেদবাণী প্রচারেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং আপামর মানবজাতিকে অসাম্প্রদায়িক মানবতার এক সুতোয় বাঁধতে সমর্থ হয়েছে -

"না হই আমি মুসলমান, না হই হিন্দুরে।
আমি ঘরে, আমি বাইরে, আমি যে সব ঠাঁই
আমি বিনে আর কিছু দেখিতে না পাই।"

(হাসন উদাস / ৩৩ সংখ্যক গান)

এই অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে মরমি আরাধনার লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করেছিল –

"তুমি আমার, আমি তোমার, এক বিনে না জানি
আমি তো শ্রী রাধিকা, তোমার কাঙালিনী।
তুমি বিনে অন্যের কাছে, নাইরে আমার মন
তোমার কাছে প্রাণ সঁপিয়াছি শ্রীরাধারমন॥"

(হাসন বাহার / প্রথম পর্ব / ১০১ সংখ্যক গান)

শাশ্বত প্রেমিক হয়ে এক মহাসাধকের দৃষ্টিতে তিনি স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে এক গভীর প্রেম সম্পর্কের সন্ধান করে গেছেন আমৃত্যু। হিংসা বিদ্বেষহীন এক সুন্দর শান্তিময় মানবসমাজ তিনি কামনা করেছেন অহরহ। তাই তো সকল সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে উঠে সকল ধর্মের সারাৎসার আত্মস্থ করে তিনি গেয়ে ওঠেন -

"চৈতন্যের দেশে নাইরে বিদ্বেষ
হাসন রাজায় বলে ভাইরে
রাখিও বিশ্বেস।
এক বিনে নাইরে জন
আমরা দুই হীনজন,
হেরি কৃষ্ণ - দরশন।"

(হাসন বাহার / দ্বিতীয় পর্ব / ৩৩ সংখ্যক গান)

এমনি বহু গানে প্রকাশিত তাঁর রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমভাবনা। জাতিত্ব তার কাছে মূল্যহীন। মানবধর্মই বড় হয়ে উঠেছে তার গানে। এককথায় তিনি ছিলেন উদার অসাম্প্রদায়িক কবি। হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ ভুলে তিনি মানবতাকেই সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। আপন হৃদয়ের দ্বার সকল সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য তিনি উন্মুক্ত রেখেছিলেন। এই মানসিকতার পিছনে তার বংশ পরম্পরার ঐতিহ্য বহমান। হাসন রাজার প্রপিতামহ হিন্দু বংশোদ্ভূত ছিলেন, যিনি ঘটনাচক্রে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। সেই থেকেই হিন্দু মুসলমান জাতি ধর্ম নির্বিশেষে এক উদার মনোভাব পারিবারিক ঐতিহ্য রূপেই চলে আসছিল। তাঁর প্রজাপ্রীতির মাঝেও এই একই অসাম্প্রদায়িক উদারতা লক্ষণীয়। আর এই অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীই তাঁকে মরমি আরাধনার লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করেছিল।

জন্ম-মৃত্যু ঈশ্বর নির্ধারিত - সবই ক্ষণস্থায়ী। ভবমাঝারে বাজিকরের মত পরমেশ্বর মনুষ্যকূলকে পুতুলের ন্যায় নাচান - এই দার্শনিকতা সাধক কবির ভাবনায় অদ্ভুত রূপ পরিগ্রহ করেছে। সকল অহঙ্কার থেকে মুক্ত হয়ে আমিত্ব বিসর্জন দিয়ে তাই তো হাসন রাজার কন্ঠে ধ্বনিত হয় -

"লোকে বলে লোকে বলে ঘর বাড়ি ভালা নয় আমার
কি ঘর বানাইব আমি শূন্যের মাঝার।"

(হাসন উদাস / ১৬৩ সংখ্যক গান)

কিংবা

"নিজে আল্লাহর মিশিয়ে যাও, না রাখিও ভয়
আমিত্বকে নাশ করিয়া হাসন রাজা কয়।"

(হাসন বাহার / প্রথম পর্ব / ২০০ সংখ্যক গান)

আমিত্ব নাশ করে বৈরাগ্যের চরম স্তরে প্রেমিক হাসন রাজা পরিণত হয়েছেন দার্শনিক হাসন রাজাতে। তাঁর গানে প্রতিফলিত হয়েছে নশ্বর পার্থিব জীবনের সারমর্ম। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের কথায় - "পঞ্চাশোর্ধে তিনি অশোকের মত চন্ড - হাসন থেকে ধর্ম-হাসনে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। তাঁর আদরের কুড়া পাখিগুলো তিনি সৌখিনদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সাধের ভাওয়ালি নৌকা তাঁর মেজো ছেলে দেওয়ান হাসিনুর রেজাকে দিয়ে ফেলেন। তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কেবল মানবসেবা করেননি, জীব সেবাও করেছেন। ... মহামতি লিও টলস্টয়ের মত জীবন

রসকে আকন্ঠ পান করেই তার প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন।" ঈশ্বরই হয়ে উঠেছিলেন তখন তাঁর একমাত্র আশ্রয় -

"আল্লা ভব সমুদ্দুরে তরাইয়া লও মোরে।
পড়িয়া দরিয়ার পাকে ডাকি হে তোমারে।
কৃপা কর দয়াল বন্ধু অনাথ জানিয়া,
রক্ষা কর তব দাসে নিজ তরী দিয়া।"

(হাসন উদাস / ৩০ সংখ্যক গান)

হাসন রাজার গানে একদিকে সুফি দর্শন, অন্যদিকে বৈষ্ণবীয় তত্ত্ব ও বাউল দেহতত্ত্বের সংমিশ্রণ ঘটেছে। এ পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি আমা হতেই - আমিই মূলশক্তি - এই ভাবনা হাসন রাজার সৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছিল। তাই তো তাঁর পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছিল -

"আমি হইতে হইয়াছে এই সংসার
আমি হইতে ত্রিজগৎ বাকি নাই আর॥
আমা হইতে আল্লাহ রসুল কেউ জুদা নয়
আমি আল্লাহর, আল্লাহ আমার, হাসন রাজায় কয়"

(হাসন বাহার / প্রথম পর্ব / ২৭৯ সংখ্যক গান)

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কন্ঠেও আমরা এই একই সুর শুনতে পাই।

"আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম -
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ কুসুম।
আমার তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে ···
··· ওগো আমার প্রভু
জানি আমি, তবু
আমায় দেখবে বলে তোমার অসীম কৌতূহল -
নইলে তো এই সূর্যতারা সকলই নিষ্ফল ···"

(২৯ সংখ্যক কবিতা, বলাকা)

মরমিয়া সাধনার বৈশিষ্ট্য এই যে, সকল জাতধর্ম ও সকল ভেদবুদ্ধির উর্দ্ধে ওঠা। সব ধর্মের মূল নির্যাস, সব সম্প্রদায়ের মিলিত ঐতিহ্য অধ্যাত্ম উপলব্ধির মধ্য দিয়ে নিজের করে নেওয়া। তখন সাধকের চেতনায় জন্ম নেয় ধর্মের এক অনির্বচনীয় অভিন্ন রূপ। সকল সাম্প্রদায়িক গন্ডি পেরিয়ে সর্বমানবিক ধর্মচেতনাকে আশ্রয় করে সাধক কবি তখন স্বসৃষ্ট সংগীতের সুর মূর্চ্ছনায় এক অনিন্দ্য সুন্দর জগৎ রচনায় ব্রতী হন। মরমি কবি, হাসন রাজার ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য কারণ তাঁর সৃষ্টিরাজিতেও আমরা দেখি পরমেশ্বরের জন্য বিরহবোধ, সাধকের অনুতপ্ত হৃদয়ের ব্যাকুলতা এবং এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সাথে গভীর একাত্মতার উপলব্ধি। সব শেষে এসে তাই বলা যায় বাউল, সুফি, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক একক কোনো মত নয় - সমস্ত আত্মস্থ করে হাসন রাজার চেতনায় জন্ম নিয়েছে এক নিজস্ব ভাবধারা, আত্মগত মননলব্ধ উপলব্ধি - সৃষ্টি তথা স্রষ্টার প্রতি সুগভীর অনুরাগ থেকে যার জন্ম; আর এখানেই মরমি কবি হাসন রাজা হয়ে উঠেছেন অনন্যসাধারণ।

গ্রন্থপঞ্জি

১। আজরফ মোহাম্মদ দেওয়ান : মরমি কবি হাসন রাজা (মঞ্জিল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৮)

২। দেওয়ান সামারীন : হাসন রাজা জীবন ও কর্ম (মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৫)

৩। গুপ্ত প্রভাতচন্দ্র : গানের রাজা হাছন রাজা (মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৫)

৪। চক্রবর্তী ডঃ মৃদুলকান্তি : হাসন রাজা, তাঁর গানের তরী (মেরিট ফেয়ার প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৭)

৫। চৌধুরী আবুল আহসান : হাসন রাজার গান (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৮)

৬। চৌধুরী আবুল আহসান : হাসন রাজা : মরমি মৃত্তিকার ফসল (উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯)

৭। ওয়াহাব আব্দুল : লালন - হাসন : জীবন-কর্ম-সমাজ (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯)

৮। উদ্দিন, আমান : হাছন - রাজার উচ্চানুভূতি : প্রেম ও বৈরাগ্য ভাবনা, (বাংলা একাডেমী, সিলেট, ১৯৯৮)

৯। দেওয়ান সামারীন : এক নজরে হাসন রাজা (মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮)

১০। দাস, ক্ষুদিরাম : রবীন্দ্র - প্রতিভার পরিচয় (পুঁথিঘর, কলকাতা - ৬, ১৯৬০)